গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৩ - ৯ ডিসেম্বর, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করুন

৬ ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় কালা দিন। সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের যুগে ধর্মীয় বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, শাসকশ্রেণীর মদতে এক সম্প্রদায়ের ধর্মস্থানের উপর অন্য সম্প্রদায়ের হামলা, ধর্মস্থান ধ্বংস ও লুঠপাঠ ইত্যাদির ইতিহাস থাকলেও বিংশ শতাব্দীতে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সভ্য মানুষের কাছে অকল্পনীয় ছিল ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঐ দিন শুধু ভারতের নয়, সমগ্র বিশ্বের সভ্য মানুষ বিস্ময় ও ঘৃণায় দেখেছিল, ভারতের অযোধ্যা নামে পরিচিত স্থানে ৫০০ বছরের পুরানো একটি ধর্মীয় সৌধ বা মসজিদকে একদল উন্মত্ত মানুষ হিন্দুত্বের জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রকাশ্য দিনের আলোয় ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিল। সরকার, প্রশাসন, পুলিশ, মিলিটারি সবই ছিল নিশ্চল নির্বাক দর্শক বা পরিষ্কার ভাষায় এই গুণ্ডামির মদতদার। ঐ উন্মত্ত তাণ্ডব শুধু মসজিদ ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি, সাম্প্রদায়িকতার আগুনে প্রাণ গিয়েছিল সরকারি হিসাবেই ৩ হাজার নিরীহ সংখ্যালঘু মানুষের।

এ তো কেবল একটি কংক্রিটের কাঠামোর ভাঙন ছিল না, সংখ্যাগরিষ্ঠের শুভ ও গণতান্ত্রিক চেতনার উপর সংখ্যালঘুর আস্থা ও বিশ্বাসকে তা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

এই বর্বরতার কোনও প্রতিকার ভারতীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও তার বিচারব্যবস্থা করেনি। সংখ্যালঘু জনগণ

আটের পাতায় দেখুন

বিশেষ পার্টি কংগ্রেস

গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করার ডাক

কমরেড প্রভাস ঘোষ সর্বসম্মতভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

২৪-২৫ নভেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিশেষ পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। ১৮টি রাজ্য থেকে ১৮৩ জন অবজার্ভার সহ মোট ৮৯০ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ১১৯ জন। কংগ্রেস থেকে সর্বসম্মতিক্রমে কমরেড প্রভাস ঘোষ সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। দেশজুড়ে একদিকে শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে এবং শাসক ও বিরোধী বুর্জোয়া দলগুলির সীমাহীন দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনগুলিকে তীব্রতর করা, অপরদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং সুসংহত আকারে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত এই বিশেষ কংগ্রেস গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর গত এক বছরে সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও অনেক বেড়েছে। বিশ্বায়ন-উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ সাধারণ মানুষকে অশেষ দুর্গতি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। মূল্যবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি লাগামছাড়া হয়েছে, যা মানুষকে ক্রমাগত অর্ধাহার-অনাহারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। অথচ শাসক দলগুলি, পতাকার রঙ তাদের যাই হোক, দুর্গত মানুষের আর্ত চিৎকারে কোনও রকম কর্ণপাত করছে না। সিপিএম ও সিপিআইয়ের মতো তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি, যারা নিজেদের মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট বলে অভিহিত করে, তারাও জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় আত্মনিয়োগ করে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। এই রকম পরিস্থিতিতে, স্বাভাবিকভাবেই গণআন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব একমাত্র যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উপরই এসে পড়েছে। এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস সেই দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালনের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি স্থির করেছে।

২৪ নভেম্বর ঠিক বিকাল ৪টায় মহাজাতি সদনের সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে পার্টির কাস্তে-হাতুড়ি-তারকা অঙ্কিত রক্তপতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান, কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমলের গার্ড অফ অনারের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসের কর্মসূচি শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন যথাক্রমে পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও কংগ্রেসে আমন্ত্রিত বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রতিনিধিরা তাঁদের নিজেদের ভাষায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কংগ্রেস উপলক্ষে গোটা এলাকা লাল পতাকা, ব্যানার-ফেস্টুনে সেজে উঠেছিল। হলের সামনে রাস্তায় ফুটপাথের গায়ে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ ও শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তা থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছিল। হলের ডানদিকের রাস্তায় দু'দিক জুড়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি, তাঁর কর্মময় রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি, দলের নেতৃত্বে দেশজোড়া গণআন্দোলনের ছবির প্রদর্শনী করা হয়েছিল, যা অসংখ্য মানুষ ভিড় করে দেখতে থাকেন। পাশেই হয়েছিল বুকস্টল। বিভিন্ন ভাষায় পার্টি প্রকাশিত বই যেমন বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা সংগ্রহ করছিলেন, তেমনই বহু সাধারণ মানুষও এই স্টল থেকে কমরেড শিবদাস ঘোষের বই সংগ্রহ করেছেন।

কংগ্রেসের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয় এক অদ্ভুত শৃঙ্খলায়, যা আরোপিত নয়, একমাত্র বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতা থেকেই যে শৃঙ্খলা জন্ম নেয়। প্রতিনিধিদের থাকার জন্য সল্টলেক স্টেডিয়ামের ডরমিটরি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ভাড়া করা বাসে করে তাঁরা যাতায়াত করেছেন। তাঁদের থাকা, খাওয়া, যাতায়াত, অধিবেশন চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবকদের তৎপরতা, সবকিছুর মধ্যেই এক দায়িত্ববোধ প্রতিফলিত হচ্ছিল।

অধিবেশন-হলে প্রবেশের সময় প্রতিটি প্রতিনিধিকে রক্ত গোলাপ দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। ইতিপূর্বে প্রতিনিধিদের জয়নগরে দলের প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে নির্বাচিত কমরেড শিবদাস ঘোষ সহ প্রথম প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সম্মিলিত ছবি স্মারক হিসাবে উপহার দেওয়া হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের স্মরণে রচিত সংগীতের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশন পরিচালনার জন্য কমরেড মানিক মুখার্জীর নেতৃত্বে কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড কল্যাণ চৌধুরী ও কমরেড ছায়া মুখার্জীকে নিয়ে এক প্রেসিডিয়াম গঠিত হয়। প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী, প্রবীণ কেন্দ্রীয় নেতা প্রয়াত কমরেড শীতেশ দাশগুপ্ত ও কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত এবং বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রণজিৎ মোদক, ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিজন দাস ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপঙ্কর রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনটি পৃথক শোক প্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অধিবেশনের সূচনা করে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, এই বিশেষ কংগ্রেসের মুখ্য এজেন্ডা হল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা। অন্যান্য দলের থেকে আমাদের দলের সংবিধানের পার্থক্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাধারণ সম্পাদককে সমগ্র পার্টির আস্থা অর্জন করতে হবে, এ জন্যই কংগ্রেস দ্বারা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। এ ছাড়াও এই কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রস্তাব পেশ করা হবে, যার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও গণআন্দোলনকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) কমরেডস দেবপ্রসাদ সরকার, ছায়া মুখার্জী, মানিক মুখার্জী, কল্যাণ চৌধুরী, ইয়াকুব পৈলান, মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, অসিত ভট্টাচার্য, রণজিৎ ধর, (দ্বিতীয় সারিতে) গোপাল কুণ্ডু, শঙ্কর সাহা, সৌমেন বসু, সত্যবান, সি কে লুকোস, কে রাধাকৃষ্ণ।

নির্ধারিত স্থানেই সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার দাবিতে এ আই ডি এস ও-র বিক্ষোভ পুরুলিয়ায়

পুরুলিয়া জেলায় প্রস্তাবিত সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও পঠন পাঠন শুরু করার বিষয়ে জেলার সমস্ত কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে ২৩ নভেম্বর পুরুলিয়া জে কে কলেজে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য একটি সভা ডাকেন। এই সভায় এ আই ডি এস ও-র পুরুলিয়া জে কে কলেজ এবং নিস্তারিনী কলেজ ইউনিটের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি পুরুলিয়া শহরের নির্ধারিত স্থানেই গড়ার দাবিতে বিক্ষোভ ও উপাচার্যের নিকট ডেপুটেশনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। বিক্ষোভের চাপে সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডেপুটেশন গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এ আই ডি এস ও-র পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদিকা সাবিত্রী মাহাত, নিস্তারিনী কলেজের ছাত্রী সংসদের সম্পাদিকা শিবানী বাউরী সহ পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি উপাচার্যের হাতে তুলে দেন। দাবিপত্রে অবিলম্বে পুরুলিয়ায় নির্ধারিত জায়গাতেই বিশ্ববিদ্যালয়টির উপযুক্ত পরিকাঠামো গঠন ও পঠন পাঠন শুরু সহ বিভিন্ন শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি তোলা হয়। উপাচার্য দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং প্রস্তাবিত এলাকাতেই অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যায় গড়ার আশ্বাস দেন।

পুরুলিয়াতে মাওবাদী দমনের নামে এস ইউ সি আই (সি) নেতা কর্মীদের ধরপাকড় করছে পুলিশ

পুরুলিয়ায় দরিদ্র মানুষের কিছু অংশকে বিভ্রান্ত করে মাওবাদীরা তাদের প্রতিপত্তি বাড়াচ্ছে। সরকার পিছন থেকে এদের মদত দিচ্ছে। আবার মাওবাদী দমনের নামে যৌথবাহিনী নিয়োগ করে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। একইসঙ্গে ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলন যাতে গড়ে না ওঠে তার জন্য আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে জামিন অযোগ্য কেস দিয়ে আটকে রাখছে। ঝালদা থানার এস ইউ সি আই (সি) দলের কর্মী এবং ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র জেলা কমিটির সদস্য দ্বারিক সিং মুড়াকে মাওবাদী বলে ১১ সেপ্টেম্বর পুলিশ গ্রেপ্তার করে। যদিও গ্রামের মানুষের প্রবল চাপে ঐ দিন রাতেই দ্বারিককে ছেড়ে দিতে তারা বাধ্য হয়। এর প্রতিবাদে ১২ সেপ্টেম্বর থানায় লিখিত প্রতিবাদ জানানো হয় এবং ব্যাপক জনগণ তাতে সামিল হয়। এই অন্যায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঝালদাতে ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। দলের আড়ষা থানার গুণ্ডই লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড সাগর আচার্যের নামেও থানায় মিথ্যা কেস দেওয়া আছে, যে কোনও দিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। এর প্রতিবাদে আড়ষায় এক বিশাল সভা হয় ১৬ নভেম্বর। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড রঙ্গলাল কুমার, জেলা কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড ডি কে মুখার্জী ও জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য্য। এরপরেই ১৬ নভেম্বর আড়ষা লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড উজ্জ্বল কুমারকে মাওবাদী লিঙ্কম্যান বলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কোর্ট ২ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করতে বলা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ না থাকায় পুলিশ উজ্জ্বলের নামে কোর্টে কোনও অভিযোগ দাখিল করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, এস ইউ সি আই (সি) নেতা-কর্মীদের উপর পুলিশ এবং ক্ষমতাসীন দলের আক্রমণের বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। প্রতিবাদী সভাগুলিতে ব্যাপক জনসমাগম ঘটছে।

এস এস সি পরীক্ষায় পরিবেশবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে আন্দোলনে ছাত্ররা

অবিলম্বে পরিবেশবিদ্যা বিষয়টিকে স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের অর্ন্তভুক্ত করা, ঐ বিষয়ে বি এড চালু, অন্যান্য বিষয়ের মতো এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া, পরিবেশবিদ্যায় উত্তীর্ণদের বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ ইত্যাদি দাবিতে ২০ নভেম্বর 'ওয়েস্ট বেঙ্গল এনভায়রন-মেন্টাল স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন'-এর নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেলে এক সমাবেশে সামিল হন। এতে উপস্থিত ছিলেন খড়গপুর আই আই টি-র ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী সৌমিত্র ব্যানার্জী, দেবাশিষ আইচ, শিক্ষাবিদ সুজয় বসু, পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ছয় বছরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'রেগুলার' এবং 'ডিসট্যান্ট' মিলিয়ে প্রায় ৩৭ হাজার ছাত্রছাত্রী পরিবেশবিদ্যায় স্নাতকোত্তর স্তরে উত্তীর্ণ হন। এদের কাউকেই নিয়োগপত্র না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও ডিনকে ডেপুটেশন দেন। ইতিপূর্বে ২ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ৬ সেপ্টেম্বর বিকাশ ভবন অভিযান করেন শিক্ষামন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেন। তাতেও সমস্যার কোনও সমাধান না হওয়ায় জেলায় জেলায় কমিটি তৈরি করে তাঁরা ডি আই এবং ডি এম-কে ডেপুটেশন দেন।

ঐ দাবিতে ২৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বি টি রোড অবরোধ করে ছাত্রছাত্রীরা। অবশেষে ডিন ও রেজিস্টার এসে ছাত্রদের সাথে দেখা করে এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। ছাত্র প্রতিনিধিরা উপাচার্যের সাথে দেখা করলে তিনিও একই প্রতিশ্রুতি দেন।

সিউড়িতে ১০ দফা দাবিতে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ

খরা কবলিত বীরভূমে কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিল মকুব, অস্থায়ী কৃষি বিদ্যুৎ সংযোগ অবিলম্বে চালু, ট্রান্সফরমার প্রতিস্থাপন এবং বেআইনি অতিরিক্ত সিকিউরিটি বিল প্রত্যাহার সহ ১০ দফা দাবিতে ২২ নভেম্বর সিউড়িতে ডিএম এবং এসই দপ্তরে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি এবং বীরভূম জেলা বৈদ্যুতিক শ্যালো-মার্সিবল কৃষিজীবী অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে প্রায় চার শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক জেলার ১৫টি সাপ্লাই থেকে সামিল হন। চাঁদমারি মাঠে জমায়েত হয়ে স্লোগান সুশৃঙ্খল মুখরিত এই মিছিল শহর পরিক্রমার পর ডিএম দপ্তরে উপস্থিত হলে বিরাট পুলিশবাহিনী মিছিলের গতিরোধ করে। জেলা সভাপতি মদন ঘটকের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল, অতিরিক্ত জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। তিনি স্থানীয় সমস্ত দাবি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর মিছিল এসই দপ্তরে যায়। সার্কেল ম্যানেজার অন্য আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনায় বসেন এবং কানেকশন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া সহ অধিকাংশ দাবিই মেনে নেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মদন ঘটক, অসিত মজুমদার, আব্দুল হালিম, আবুল কালাম, শেফালী তেওয়ারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

বিপ্লবী সংগ্রামে এক অনন্য চরিত্র

কমরেড কাজললতা নস্করের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার রায়দিঘি থানার রাধাকান্তপুর ১নং লোকাল কমিটির সদস্যা, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিশিষ্ট নেত্রী কমরেড কাজললতা নস্কর ১২ নভেম্বর রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছুদিন ধরে তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

কমরেড নস্কর ১৯৬৯ সালে তাঁর স্বামী, দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম প্রবীণ সদস্য ও শিক্ষক নেতা কমরেড সহদেব নস্করের মাধ্যমে তৎকালীন খাস ও বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের সান্নিধ্যে এসে সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হন। সেই থেকে তিনি দলের সকল কর্মসূচি ও গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সাথে সাথে অঞ্চলের মহিলাদের সংগঠিত করে আঞ্চলিক মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের আঞ্চলিক সভানেত্রী ও জেলা সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টার পদে আসীন ছিলেন। অমায়িক ব্যবহার, কর্মদক্ষতা ও চরিত্রগুণে প্রয়াত কমরেড নস্কর সকলের প্রিয় সাথী ও আপনজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার অগণিত দলীয় কর্মী-সমর্থক ও গুণগ্রাহী তাঁদের প্রিয় নেত্রীকে শেষ দেখা দেখতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। অসুস্থতার জন্য উপস্থিত না থাকতে পারায় জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলানের পক্ষে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মাদার নস্কর, রাজ্য কমিটির পক্ষে কমরেড গোপাল বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং পার্টিজীবনে তাঁর দীর্ঘদিনের সাথী জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম প্রবীণ সদস্য কমরেড দীপ্তি সরকার, কমরেড সহদেব নস্কর সহ উপস্থিত অন্যান্য জেলা কমিটির সদস্য ও গণসংগঠনের নেতা-নেত্রীরা প্রয়াত কমরেডের মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তাঁর পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন ও অন্যরাও তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রয়াত কমরেড নস্করের স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর প্রবীণ সদস্য কমরেড প্রীতীশ কর। তিনি দল ও দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রতি প্রয়াত কমরেড কাজললতার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা উল্লেখ করে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা তাঁর ছোট্ট পত্রটি পাঠ করে শোনান।

প্রয়াত কমরেড কাজললতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধান বক্তা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বলেন, আজীবন কঠিন কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী আদর্শের এক বিশেষীকৃত রূপ দিয়ে গেছেন সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ, যা আজ দেশ ও বিদেশে মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। তিনি বলেন, মৃত্যুর মাত্র ২৫ দিন আগে প্রয়াত কমরেডের লিখিত চিঠি, যা কমরেড সভাপতি আপনাদের পাঠ করে শোনালেন, কয়েক ছত্রে লেখা সেই চিঠিটি বলে দিচ্ছে, তিনি কত বড় মাপের এক বিরল বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অনেকের কাছেই অজানা প্রত্যন্ত গ্রামের গৃহবধূ সদা হাস্যময় সহজ সরল এই নিরসল কর্মীটির মন ছিল আয়নার মত পরিষ্কার। সেখানে হীনতা, নীচতা, সংকীর্ণতা বলতে কিছু ছিল না। সাংসারিক জীবনে আসার পর তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সান্নিধ্যে আসেন। একদিকে সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব, চাষবাস থেকে শুরু করে ছেলেমেয়ে-স্বামী — সবকিছু একা সামলেছেন এবং তার মধ্যেই দলের আদর্শ-নীতিকে যখন বুঝতে পেরেছেন, তখন থেকেই দলের কাজকে জীবনের মূলমন্ত্র করে প্রতিটি কর্মসূচিতে নিজে এগিয়ে এসেছেন এবং অন্যদেরও সংগঠিত করে আন্দোলনে সামিল করেছেন। একদিকে সংসারের কাজ, অন্যদিকে 'দলই জীবন' — এভাবেই সারা দিনরাত আনন্দের সাথে কাজ করে গেছেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠলে সাংসারিক বিষয় এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু সকল সমস্যা নিয়েই তিনি পার্টির শিক্ষা অনুযায়ী নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করতেন এবং নেতৃত্বের গাইডেন্স নিয়ে চলতেন। শরীরে যখন নানা রোগ এসে ভীড় করেছে এবং সাথে সাথে বয়স বেড়েছে, তখন আগের মতো পরিশ্রম করে দলের কাজ করতে না পারার জন্য মানসিক কষ্টে ভুগতেন। তা সত্ত্বেও দলের আন্দোলনের কথা, সংগঠনের কথা, দলের কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব সম্পর্কে এবং সকল কমরেডদের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিতেন। অর্থাৎ আমাদের পার্টির সকলেই যে একই পরিবারভুক্ত — এই উন্নত হৃদয়বৃত্তি, বিপ্লবী চেতনা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন প্রয়াত কমরেড কাজললতা নস্কর। নিজের অসুবিধা বা কষ্টের কথা সাধারণত বলতেন না। তাই দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের মৃত্যুযন্ত্রণাও তাঁকে দলের চিন্তা ও জীবন থেকে এতটুকুও বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এই সত্যটাই ওঁর ৩/৪ লাইনের চিঠির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। রাধাকান্তপুর থেকে অসুস্থ অবস্থাতেই তিনি জয়নগরে এক আত্মীয়ের বাড়ি এসে এক মাস থেকে ফিরে যাওয়ার আগে লিখছেন, ''আমি আজ এক মাস হল অনাদি নস্করের বাড়িতে ছিলাম। বাড়ির ভিতরে থেকেও সর্বদাই আমার মনের আয়নায় দেখেছি কমরেডদের মুখ। কমরেডদের ভালবাসা আমার হৃদয়ে গাঁথা। আজ আবার রাধাকান্তপুর ফিরে যাচ্ছি, জয়নগরে মনে হয় আমার এই শেষ আসা। সকল কমরেডকে আমার ভালবাসা দেবেন।'' বোঝাই যায়, অবধারিত মৃত্যু তিনি টের পেয়েছিলেন।

আপনাদের সামনে এই কথাগুলো বলার সময় বিবেকে ধাক্কা দেয়, আমরা নিজেদের জীবনকে এইভাবে কতটুকু গড়ে তুলতে পেরেছি। তাই এই কমরেডের জীবন সংগ্রাম আমাদের সকলের কাছেই উন্নততর বিপ্লবী জীবন গড়ে তোলার এক অমূল্য আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে।

কমরেড কাজললতা নস্কর লাল সেলাম

জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাব

বিশ্বপুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় পুঁজিবাদ গভীর সংকটে নিমজ্জিত

২৪-২৫ নভেম্বর কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত বিশেষ পার্টি কংগ্রেসে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং গণসংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রামকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে —

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বিশেষ পার্টি কংগ্রেস এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন জনজীবনের দুর্দশা ক্রমাগত বাড়ছে। এ কথাটাই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত দলিলে বলা হয়েছিল। এও দেখানো হয়েছিল যে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ এবং তার সঙ্গে বিশ্বায়ন উদারিকরণ ও বেসরকারীকরণের নীতি মানুষকে আজ দুর্ভোগ ও দুর্দশা ছাড়া কিছু দিতে পারে না। সকল অংশের মেহনতি জনগণের জীবনযাপনে দুর্দশার উত্তরোত্তর প্রকোপ মনুষ্যেতর স্তরে পৌঁছেছে।

এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস মনে করে বিশ্বপুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতীয় পুঁজিবাদও এক অভূতপূর্ব সংকটে নিমজ্জিত এবং সে কারণে সম্প্রতি মন্দার যে প্রকোপ বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে তার ধাক্কা ভারতীয় অর্থনীতিতেও পড়েছে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের চেষ্টায় ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের সেবাদাস সরকারগুলির সহায়তায় মেহনতি জনগণের উপর শোষণের মাত্রা আরও তীব্র ও নগ্ন করেছে। অন্যদিকে ভারতের কর্পোরেট ক্ষেত্রকে সংকট থেকে বেরোতে সাহায্য করার জন্য 'স্টিমুলাস প্যাকেজ'-এর নামে একের পর এক সুযোগসুবিধা দিয়ে যাচ্ছে; একইসঙ্গে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে বিশ্ববাজারে আরও জায়গা করার প্রবল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছে যে, জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যমান আকাশছোঁয়া হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। অপরিহার্য পণ্যগুলির উপর থেকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ায় এই ক্ষেত্রে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের ক্রমাগত অনুপ্রবেশ, তার সঙ্গে বিভিন্ন সরকারগুলির দ্বারা অনুসৃত চূড়ান্ত জনবিরোধী আর্থিক নীতি এবং মজুতদারি ও কালোবাজারি এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী। কেন্দ্রের সরকারে একের পর এক যে দলই এসেছে তারাই পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে পেট্রোল ডিজেল ও কেরোসিনের দাম বাড়িয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য সরকারও পেট্রোপণ্যের উপর বিক্রয় কর, আবগারি শুল্ক ইত্যাদি বাড়িয়ে নিজেদের পকেট ভরেছে। আর এই সব কিছুর পরিণামে মূল্যবৃদ্ধির অসহ্য বোঝা নিয়ে জনগণ পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। এ কথা সকলের কাছেই পরিষ্কার যে সম্প্রতি পেট্রোপণ্যের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার পরিণাম মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলবে এবং আরও মূল্যবৃদ্ধিতে ইন্ধন দিয়ে জনগণের গলার ফাঁসকে আরও শক্ত করবে। গণবণ্টন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ার মুখে। এতদিন পর্যন্ত সামান্য হলেও খাদ্য নিরাপত্তা যতটুকু ছিল তাকেও বিপন্ন করতে ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার গুদাম ঘরগুলিকে বেসরকারি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। পতাকার রঙ যাই হোক না কেন কোনও দলের সরকারই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনসাধারণের আর্তনাদে কর্ণপাত করছে না। সাধারণ মানুষের প্রতি বুর্জোয়া সরকারগুলির এই নিষ্ঠুর ও অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নগ্ন হয়ে গেছে। সরকারি গুদামে মজুত খাদ্যশস্য জনসাধারণ পাওয়ার পরিবর্তে ইঁদুর ও পোকা মাকড়ের উদরস্থ হচ্ছে জেনে ঐ খাদ্যশস্য অবিলম্বে হয় সামান্যতম মূল্যে বা বিনামূল্যে গরিবদের দেওয়ার জন্য আদেশ দিতে সুপ্রিম কোর্ট বাধ্য হয়েছে। আরও নির্মম ঘটনা হল, সুপ্রিম কোর্টের এই আদেশকেও সরকার নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করেছে। এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে মনে করে মূল্যবৃদ্ধির চাপে জর্জরিত সাধারণ মানুষকে রিলিফ জোগাতে পুঁজিবাদী সরকারকে বাধ্য করার জন্য খাদ্যশস্যের পাইকারি ও খুচরো উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মূল কথা হল, দানাশস্য ও অন্যান্য সমস্ত অপরিহার্য পণ্য ক্রয় করা এবং ন্যায্য মূল্যে তা জনসাধারণকে বিতরণ করার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দল দৃঢ়ভাবে মনে করে, মূল্যবৃদ্ধির নিরন্তর আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি নিয়ে সকল বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা এই সময়ের জরুরি দাবি।

কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা হল সিপিএম, সিপিআই ও তাদের মিত্র দলগুলি যারা নিজেদের শুধু বামপন্থী নয় 'মার্কসবাদী' ও 'কমিউনিস্ট' বলে দাবি করে, তারা এই রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিরোধী, যা তাদের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে একথা বলাই বাহুল্য যে, দেশের অন্যান্য লড়াকু শক্তিগুলি, যারা আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়, তাদের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে এই ধরনের একটি দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের দলকেই গ্রহণ করতে হবে। এ এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব যা আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে হবে।

এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস লক্ষ করছে যে, বিভিন্ন শিল্পসংস্থা বন্ধ করে দেওয়া, কর্মী সংখ্যা হ্রাস করার মতো ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে যার ফলে দেশে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে দ্রুত গতিতে। অবস্থা আজ এমনই যে যারা আজ কিছু না কিছু চাকরিও করছে, তাদের চাকরিকে জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত বলা যাবে না, কারণ তাঁরা বেতন বা মজুরি হিসাবে যা পান তা দিয়ে দু'বেলা খাদ্য জোটানোই কঠিন। দেশে শ্রমজীবী জনগণের ৯৬ শতাংশই প্রান্তিক শ্রমিকদের পর্যায়ে পড়ে। ইতিপূর্বে গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণের জন্য সরকারগুলো যে সব কল্যাণমূলক ও সামাজিক সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলো নিত সেগুলিও

প্রস্তাব পেশ করছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

আজ অত্যন্ত নগ্নভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। পেনশন পাওয়ার যে অধিকার শ্রমিক কর্মচারীদের ছিল, শ্রমিক সংগঠনগুলির তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে অধিকার কেড়ে নিয়ে কন্ট্রিবিউটারি পেনশন স্কীম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পেনশন প্রভৃতি সকল পরিষেবা ক্ষেত্রকেই মুনাফা লুটতে বেসরকারি একচেটিয়া পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। একটা সভ্য সমাজে ন্যূনতম সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে শ্রমিকরা ইতিপূর্বে লড়াই করে মালিকশ্রেণীর কাছ থেকে যতটুক সুরক্ষা ও অধিকার আদায় করেছিল, তা সর্বত্র চুক্তি বা ঠিকা প্রথা চালু, সেজ গঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বর্বরভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস লক্ষ করছে যে, দেশের কৃষকদের অবস্থা প্রতিদিন আরও খারাপ হচ্ছে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও রাজ্যে, চড়া সুদে নেওয়া ঋণের ভার বহন করতে না পেরে চাষীদের আত্মহত্যার সংবাদ প্রকাশ পাচ্ছে। আবাসন ব্যবসায়ে নিযুক্ত বৃহৎ পুঁজি ও বড় বড় শিল্পপতিদের স্বার্থে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (সেজ) গঠন করার জন্য চাষীদের জমি কেড়ে নেওয়ার নানান ফন্দি ফিকির বের করতে শাসকশ্রেণী তৎপর হয়েছে। এজন্য সরকারি সংস্থার হাতে সীমাহীন ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে, যার দ্বারা তারা বহু ফসলি জমি পর্যন্ত শুধুমাত্র নোটিশ জারি করে ও নামমাত্র মূল্য দিয়ে কেড়ে নিয়ে 'জমি ব্যাঙ্কে' গচ্ছিত করছে। কৃষি কাজে ব্যবহৃত নানা উপকরণের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি নিজেদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার ফলে কৃষকদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র জীবন ধারণের প্রয়োজনে এখন কৃষিক্ষেত্র থেকে তাই দলে দলে 'মাইগ্র্যান্ট' শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন শহরে ভিড় করছে।

এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস লক্ষ করছে যে, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন আর্থিক পরিস্থিতি এবং মেহনতি মানুষের জীবনে প্রবল দুর্দশার পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে ভারতের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অতি দ্রুত আরও প্রকট হচ্ছে। তার সম্প্রসারণবাদী প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণেই ভারত তার পূর্বেকার জোট নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সরে গিয়েছে এবং উত্তরোত্তর সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের শরিক হয়ে উঠছে। বিস্ময়ের কিছু নেই যে, সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের সর্দার আমেরিকার সরকারও ভারতের শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা চায় এবং তার দ্বারা ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার অনুগত শরিকে পরিণত করতে চায়। একারণেই ভারতে আসার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে। যাতে নিজ নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য ভারতকে তাদের দলে সামিল করতে পারে।

এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছে যে, পার্লামেন্টে শিক্ষা সংক্রান্ত একের পর এক আইন পাশ করানোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার পণ্যায়ন এক বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে। এইসব নতুন নতুন আইনের দ্বারা দেশের এবং বিদেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রকে খুলে দেওয়া হচ্ছে, যাতে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করে তারা শত শত কোটি টাকা মুনাফা লুঠতে পারে — যে কথা দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের দলিলেও বলা হয়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযান, জাতীয় ও রাজ্য নলেজ কমিশন, যশপাল কমিটির সুপারিশ, ডি পি ই পি, এনসিএইচইআর, এডুকেশন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি সবকিছুরই উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার পণ্যায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ করা। এর ফলে শিক্ষাতেও জনগণের মধ্যে দুটি ভাগ করা হচ্ছে। একদিকে ধনী সম্প্রদায়, যারা শিক্ষা কেনবার ক্ষমতা রাখে, তারা দেশের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনায়াসে ঢুকে যাবে এবং টাকা দিতে পারার ক্ষমতার বিনিময়ে ইচ্ছামতো বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েও চলে যাবে। অন্যদিকে গরিবরা বাজারে কায়িক শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু দক্ষতা শেখার মধ্যেই নিজেদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের অবস্থা প্রায় একই রকম বা এর থেকেও শোচনীয় বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলির সুপারিশ মেনে গোটা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকেই ঢেলে সাজানো হচ্ছে এবং 'বিনিয়োগকারীদের' অবাধ মুনাফাক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছে। দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার বেসরকারীকরণের ব্লুপ্রিন্ট হিসাবেই তৈরি করা হয়েছে দ্য ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত সরকার দ্বারা পরিচালিত প্রায় সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভেঙে দেওয়ার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যাতে এইসব ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজিকে জনগণের অগোচরে নিয়ে আসা যায়। গরিব মানুষের জন্য সরকারি হাসপাতালগুলিতে ইতিপূর্বে হয় বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে চিকিৎসা পাওয়ার যে সুযোগ ছিল তাও উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বস্তুত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী গরিবের মধ্যে বৈষম্য চরম জায়গায় পৌঁছেছে — ধনীদের জন্য ফাইভ স্টার হসপিটাল তৈরি হচ্ছে, গরিবদের জন্য পড়ে থাকছে চিকিৎসক ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধাহীন হাসপাতালগুলি।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আক্রমণ ভয়াবহ। বিনোদনের নামে সরকার ও শাসকশ্রেণীর মদতে অপসংস্কৃতির বন্যা বইয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই পরিণামে দেশের মধ্যেই নারীদের উপর আক্রমণ ক্রমাগত বাড়ছে। আজ একবিংশ শতাব্দীতেও এদেশে অনার কিলিং-এর মতো বর্বর কান্ড ঘটছে এবং সরকার তা নীরবে দেখে যাচ্ছে। এই ধরনের মধ্যযুগীয় প্রথার চর্চা প্রমাণ করে মৌলবাদ আজ সমাজমননে গভীরভাবে ঢুকে আছে যার বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিটি মানুষের সোচ্চার হওয়া দরকার।

এদেশের আইনশৃঙ্খলার তথাকথিত রক্ষকদের হাতে বন্দীহত্যার মতো ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা দেখিয়ে দেয় যে, পরাধীন দেশের পুলিশের এ ধরনের আচার আচরণ স্বাধীন দেশের পুঁজিবাদী শাসকরা বন্ধ করার পরিবর্তে উৎসাহ দেওয়াই শ্রেয় মনে করছে। এই ধরনের ফ্যাসিস্ট সুলভ অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই গড়ে তোলার জন্য আমাদের পার্টি গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে।

ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য ফলাফল হিসাবে গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যুক্ত করে দুর্নীতির একের পর এক ঘটনা প্রকাশ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নেতা মন্ত্রীরাই শুধু নন, সামরিক বাহিনী এমনকী বিচারবিভাগেও দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির ঘটনা চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। একথা পরিষ্কার যে, আমাদের দেশের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। এর হাত থেকে বাঁচার জন্য জনগণের সামনে আন্দোলন ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

চারদিক থেকে সমস্যায় সংকটে জর্জরিত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনগণের ক্ষোভ বিক্ষোভ অনেকটা ভূমিকম্পের মতো ফেটে পড়ছে। এইসব বিক্ষোভের পিছনকার আশু কারণ আলাদা আলাদা হলেও মূল কারণটা সর্বত্র একই — তা হচ্ছে চরম দারিদ্র, বেকারি, প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহভঙ্গ ও জীবনের নিরপত্তাহীনতা। এসবেরই উৎস এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই সঠিক লক্ষ্য ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এইসব বিক্ষোভগুলো বিভিন্ন ভাষাভাষী ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতের মেহনতি জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিভেদ ডেকে আনছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ার রূপে প্রকৃত বাম গণতান্ত্রিক ফোরামের অনুপস্থিতির কারণে জনগণের মধ্যেকার এই সংকীর্ণ ভেদাভেদ প্রতিদিন বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে এবং তার সুযোগ নিচ্ছে শাসক শ্রেণী।

কাশ্মীরের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বিশেষ করে জুন মাসে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এক কাশ্মীরি যুবকের মৃত্যুর পর জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি ক্রমেই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। আমাদের পার্টি বরাবর বলে এসেছে যে, স্বাধীনতার সময় থেকে, এমনকী কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তির কালি শুকোবার আগেই ভারত সরকারের আচরণে কাশ্মীরের জনগণ মনে করেছে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। কাশ্মীর সংক্রান্ত সংবিধানের বিধানকে বিকৃত করেছে, লঙ্ঘন করেছে

চারের পাতায় দেখুন

জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে

অযোধ্যা রায়, কাশ্মীর পরিস্থিতি ও 'মাওবাদী' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হল

তিনের পাতার পর

কেন্দ্রে আসীন প্রায় প্রতিটি সরকারই। যেদিন শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা শেখ আবদুল্লাকে, 'তিনি কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবির দিকে ঝুঁকেছেন' এই মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলবন্দী করা হয় এবং তাঁর নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত শুরু করা হয় সে সময় থেকেই কাশ্মীরের পরিস্থিতি গুরুতর রূপ নিতে শুরু করেছে। তদুপরি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতে একের পর এক অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার মতো ভয়ঙ্কর বর্বরতা, যার পরিণতিতে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে শত শত সংখ্যালঘু নিরীহ জনগণের প্রাণ চলে গেছে, এবং তার সাথে গুজরাটেও গণহত্যা প্রভৃতি সব ঘটনা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র সম্পর্কে কাশ্মীরের জনগণের স্বপ্নভঙ্গের কারণ হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দল দীর্ঘ সময় ধরে বলে আসছে একদিকে কাশ্মীরের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের যে অধিকার ভারতভুক্তির চুক্তিপত্রে নিশ্চিত করা হয়েছিল, যার সাংবিধানিক গ্যারান্টি হিসাবেই এসেছিল ৩৭০ ধারা, সেই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিকভাবে কাশ্মীরের উন্নয়ন ঘটাবার সামগ্রিক পরিকল্পনা কার্যকর করার মধ্য দিয়েই একমাত্র কাশ্মীরের জনগণের আস্থা জয় করা সম্ভব। ভারতের সঙ্গে

মহাজাতি সদনের পাশে কমরেড শিবদাস ঘোষের কর্মময় জীবন ও উদ্ধৃতি এবং দলের সর্বভারতীয় সংগ্রামের ছবির প্রদর্শনী

কাশ্মীরের যথার্থ মিশ্রণ ঘটাবার প্রয়োজনে এই আস্থা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার দ্বারাই একমাত্র কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করা সম্ভব।

আমাদের দল অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ও শক্তিগুলির এই যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, তা গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর দাবি করে এলেও সব রঙের দলের সরকারগুলোই বিরোধ মীমাংসার জন্য বেয়নটের উপর নির্ভর করার পথ নিয়েছে, যেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, উত্তরোত্তর সামরিক বাহিনীর ব্যবহার ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ঘটনার ফলে কাশ্মীরের পরিস্থিতিও উত্তরোত্তর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই আমরা আবারও দাবি করছি, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত সমস্তরকম সামরিক অপারেশন বন্ধ রেখে আলাপ আলোচনার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। এ জন্য বন্দিদশা থেকে নিরীহ মানুষদের অবিলম্বে মুক্ত করা দরকার, ধর্ষণকারী ও অত্যাচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার, নিহতদের পরিজনের হাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া দরকার ও আহতদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা দরকার।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদের জমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তা শুধু জঘন্যই নয়, বুর্জোয়া আইনশাস্ত্রের মূলনীতিগুলিরও সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এক কথায় নজিরবিহীন। তথ্য, যুক্তি বিচার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ বুর্জোয়া আইনশাস্ত্রের মূল ধারণা হিসাবে ইতিহাসে এসেছে, সামন্তী শাসনে রাজার ইচ্ছাই শেষ কথা — এই স্বৈরাচারী বিচার ধারার বিরুদ্ধতা করে। সেই বুর্জোয়া আইনশাস্ত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় অন্ধবিশ্বাস ও কল্পনাকেই ন্যায়বিচারের ভিত্তি হিসাবে ধরেছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভাবধারার যতটুকু অবশিষ্ট এ দেশে ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় তাকে চরম আঘাত হেনেছে। বাবরি মসজিদের মতো ৫০০ বছরেরও পুরানো একটি ধর্মীয় সৌধকে ভেঙে ফেলার মতো ক্রিমিনাল কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থেকে এবং সারা দেশ জুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শত শত মানুষকে হত্যা করার মতো ফ্যাসিস্ট কার্যক্রমকে কোনও বিচারে না এনে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ফাঁকা জমির তিনটি সমান ভাগ তিন মামলাকারীকে দিয়েছে। এর দ্বারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার ক্রিমিনাল কাজকে শুধু আইনসিদ্ধ করা হল তাই নয়, ঐ জঘন্য কাজটি যারা করেছে তাদেরও কার্যত পুরস্কৃত করা হল। বাবরি মসজিদ তৈরির আগে ঐ স্থানে রামমন্দির ছিল কি না, সে প্রশ্নের বিচারে আদালতের কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ ও বিশ্বাস সমার্থক হয়ে গেল। সুতরাং সকলের কাছে এ কথা পরিষ্কার যে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কোনও বিষয় বিচারের যে গণতান্ত্রিক ধারণা রয়েছে, এই রায় তার গোড়ায় আঘাত করেছে। এই রায়ে শুধু চরম সাম্প্রদায়িক বুর্জোয়া পেটি-বুর্জোয়া দলগুলিই খুশি হয়নি, এমনকী এই রায় মেকী বামপন্থীদেরও সন্তুষ্ট করেছে। এই রায় খুবই সন্তোষজনক এমন একটা ধ্যান ধারণা সৃষ্টি করতে সংবাদমাধ্যমের একাংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের পার্টি দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, এই রায় সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিচার করেছে শুধু নয়, তার চেয়েও উদ্বেগজনক ঘটনা হল, এর মধ্য দিয়ে অন্ধ, রেজিমেন্টেড চিন্তাকেই উৎসাহ দেওয়া হল; কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী, যা শেষপর্যন্ত ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয় এবং মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই ধ্বংস করে। এই কারণেই আমাদের দল ভারতের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ, ইতিহাসবিদ, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার মানুষের সাথে গলা মিলিয়ে এই রায়কে আইনশাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং বাতিলযোগ্য বলে নিন্দা করেছে।

আমাদের দলের দ্বিতীয় কংগ্রেস স্পষ্টভাষায় বলেছিল যে, জাতপাতের রাজনীতিতে কংগ্রেস বিজেপি-ই শুধু ইন্ধন দিচ্ছে তা নয়, আরজেডি, বিজেডি, জেডি(ইউ), এলজেপি, সিপিএম এবং সিপিআই-এর মতো আঞ্চলিক দলগুলিও নিজেদের ক্ষুদ্রস্বার্থে নানা বিভেদকামী দলগুলির সঙ্গে মাখামাখি করছে। উদ্বেগের বিষয় হল, এই জাতপাতের রাজনীতি বাধাহীনভাবে চলেছে এবং মেহনতি জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পথে গুরুতর বাধা হিসাবে কাজ করছে। এই কারণেই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস জাতপাতের রাজনীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা নিতে দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানাচ্ছে।

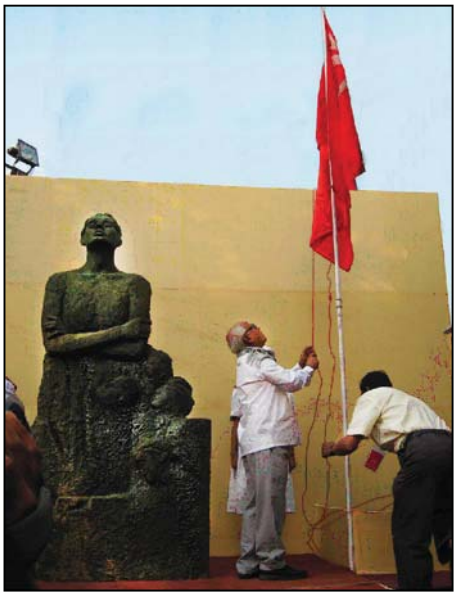

শহিদ বেদির পাশে রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

বিশেষ পার্টি কংগ্রেস আরও যে জিনিসটি লক্ষ করছে তা হল, শাসকশ্রেণী ও মেকি বামপন্থীদের মদতে সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম ক্রমাগত 'মাওবাদীদের' সম্পর্কে একটা বিরাট ভাবমূর্তি গড়ে তুলে দেখাচ্ছে যে, এই 'মাওবাদীরা' যেন প্রকৃতই শোষণ ও অত্যাচার থেকে মেহনতি জনগণের মুক্তি আন্দোলনে নিয়োজিত আছে। লক্ষণীয় যে, নকশালবাদী আন্দোলনকে একটা যথার্থ বিদ্রোহ রূপে দেখিয়ে যে ভাবমূর্তি একসময় গড়ে তোলা হয়েছিল তা ক্ষয়প্রাপ্ত ও মলিন হয়ে যাওয়ার কয়েক দশক পরে আবার নতুন করে মাওবাদীদের সামনে এনে তেমন একটা ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের দলিলে আমরা পরিষ্কারভাবেই দেখিয়েছিলাম যে, এই মাওবাদীরা মহান মাওয়ের শিক্ষাগুলিকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং তাঁর লাইন ও চিন্তাধারার সঙ্গে এই মাওবাদীদের কাজকর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা আরও দেখিয়েছিলাম, জনসাধারণকে আদর্শগত ও সংগঠনগতভাবে প্রস্তুত না করে এই মাওবাদীরা ব্যক্তিহত্যা ও উদ্দেশ্যহীন রক্তপাতের রাজনীতি করে যাচ্ছে এবং তারা দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীকে বিপ্লবের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করছেন না, পরিবর্তে মনগড়াভাবে মূল শত্রু হিসাবে দেখাচ্ছে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে। শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে। যার পরিণামে এই মাওবাদীদের ফোলানো ফাঁপানো ভাবমূর্তি তৈরি করে প্রবল প্রচার চালানো হচ্ছে। এর দ্বারা শাসকশ্রেণীর দুটি স্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছে। প্রথমত 'মাওবাদী সন্ত্রাস' দমনের নামে প্রশাসন দানবীয় ক্ষমতা হাতে নিচ্ছে, যার মাধ্যমে জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত গণআন্দোলনকেই দমন করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে, যাতে তারা নৈরাজ্যবাদকে বিপ্লব মনে করে আত্মহননের পথে চলে যায়।

বিশেষ পার্টি কংগ্রেস আরও দেখিয়েছে যে, সিপিএম ও সিপিআই-এর জঘন্য সুবিধাবাদ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যেখানে তারা সরকারে আছে সেখানে বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ, শ্রমিকশ্রেণীর সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার ইত্যাদি পদক্ষেপগুলি শাসকশ্রেণীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তো নিচ্ছেই, সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের মতো জনসাধারণের আন্দোলনকেও নৃশংসভাবে দমন করতে পিছপা হচ্ছে না। বুর্জোয়া সরকার থেকে কিছু রিলিফ আদায় করারও একমাত্র পথ যে যুক্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলে এবং রাজনৈতিক সচেতনতাবৃদ্ধির মারফত পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাস্তা প্রশস্ত হতে পারে — এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই বিশেষ কংগ্রেস বলেছে যে, গণআন্দোলন ও জনগণের প্রতি সিপিএম, সিপিআই-এর মতো দলগুলির বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাদের সুবিধাবাদী চরিত্রকে পুরোপুরি উদঘাটিত এবং পরাস্ত করতে না পারলে বিপ্লবের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারেনা।

একথাও সত্য যে, বহু রাজ্যে মেকি বামপন্থীদের মুখোশ খসে পড়েছে। জনগণ তাদের আসল চরিত্র উপলব্ধি করছে এবং গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি হিসাবে আমাদের দলকেই চিনতে পারছে। মেকি বামপন্থী দলগুলির ভূমিকায় হতাশ হয়ে ঐ সমস্ত দলের সৎ কর্মী সমর্থকরাও আমাদের দলের দিকে তাকিয়ে আছে।

পরিস্থিতির এই চাহিদা উপলব্ধি করেই দলের সকল নেতা কর্মী সমর্থক ও দরদীদের বিপুল উদ্যমে দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস। জনসাধারণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলাকেই বিপ্লবীরা জীবনের সার্থকতা মনে করে। সর্বহারার মহান নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক স্ট্যালিন বার বার বলেছেন, বিপ্লব আপনা-আপনি ঘটে না, লড়াই করে তাকে জয় করতে হয়। এজন্য সঠিক কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণের অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগঠন একটি পূর্বশর্ত। একদম তলা থেকে জনসাধারণের সংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে তুলতে হবে উপযুক্ত শ্রেণী চেতনার ভিত্তিতে, যেগুলি হবে জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির আধার। এজন্য বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনমুখী শক্তিগুলির সাথে যুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বকে যুক্ত করে নাগরিক কমিটি যেখানে প্রয়োজন, এবং সম্ভব গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি দলের একক শক্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যও ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এজন্য দলের সমস্ত স্তরে সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করে উন্নত আদর্শগত মান ও চরিত্র অর্জন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমেরিকায়

‘মধ্যবিত্তের স্বপ্ন’ ভেঙে চুরমার

মহামন্দার জেরে বিশ্বের ‘সুপারপাওয়ার’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা নড়বড়ে, তা আজ সকলেরই জানা। দেউলিয়া হয়ে পড়া বৃহৎ কোম্পানিগুলিকে বাঁচাতে আমেরিকার সরকার পুঁজিপতিদের পকেটে রাজস্বের কী বিরাট অংশ ঢেলে দিয়েছে, তাও কারোর অজানা নেই। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ টাকা শাসকরা কোথা থেকে জোগাড় করল, তা বোধহয় অনেকেরই অজানা। আসলে সাধারণ মার্কিন জনতার জন্য বরাদ্দ থেকে বিপুল পরিমাণ কাটছাঁট করেই এই টাকা জোগাড় করা হয়েছে। আমেরিকা আজও বহু মানুষের কাছে স্বপ্নের দেশ, প্রাচুর্যের স্বর্গরাজ্য। সম্প্রতি কানাডার একটি পত্রিকা ‘ম্যাকলিনস’ তার রিপোর্টে সে দেশের ভিতরকার যে চেহারাটি তুলে ধরেছে, তা প্রকাশিত হয়েছে ‘নর্থস্টার কম্পাস’ পত্রিকার নভেম্বর ’১০ সংখ্যায়।

পত্রিকাটি লিখছে, আমেরিকার জনজীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এখন তৃতীয় বিশ্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের বিশেষ পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে দেশের ওহিও রাজ্যের একটি এলাকা (কাউন্টি) আস্তাবুলার কথা উল্লেখ করে তারা বলেছে, গত ফেব্রুয়ারিতে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন বাজেট ঘাটতি মোকাবিলায় এলাকার মানুষের জন্য বরাদ্দ অর্থে কাটছাঁট করতে শুরু করে। সেখানকার পুলিশ দপ্তরে কয়েক বছর আগেও ১১২ জন কর্মী ছিল, পরে সেটা কমে দাঁড়িয়েছিল ৭০-এ। এবার সেই সংখ্যা আরও কমিয়ে তারা মাত্র ৪৯ জন লোককে কাজে বহাল রেখেছে। দীর্ঘ ১৯০০ বর্গ-কিমি জায়গা নিয়ে তৈরি হওয়া এই অঞ্চলটির জন্য এখন রয়েছে একটি মাত্র পুলিশের গাড়ি। এই এলাকার ড্রাগ দমনকারী গোয়েন্দা বিভাগের এক সময় খুব নামডাক ছিল, আজ সেই গোয়েন্দা বিভাগের কোনও অস্তিত্বই নেই। সেখানকার ডেপুটি শেরিফ খুব দুঃখের সাথে জানিয়েছেন, এলাকায় চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, ঘরবাড়ি লুঠ হয়ে যাচ্ছে, অথচ আমাদের একজনও নেই যে এগুলোর তদন্ত করে। এখন আমাদের একমাত্র কাজ হয়েছে, কারোর বাড়িতে চুরি হলে বিমা কোম্পানিতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য চিঠি লেখা। পুলিশবিহীন এরকম বহু এলাকাই এখন রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। রাজস্বের হাল এতটাই খারাপ যে, বহু জায়গায় খরচ বাঁচাতে পাথর বাঁধানো পথের পরিবর্তে নুড়ি বিছানো পথের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনকে।

আসুন, আমেরিকার আর্থিক মন্দার ভয়াল চেহারাটার দিকে চোখ ফেরানো যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি হিসাবে বেকারির হার ৯.৫ শতাংশ। পুরনো বাড়ি বিক্রির হার ভীষণ কমে গেছে। বিক্রির জন্য তৈরি হওয়া নতুন বাড়ি পড়ে রয়েছে, কেনার খদ্দের নেই। গোটা দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধির হারও খুবই কম — এ বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মাত্র ১.৬ শতাংশ। চাকরির সুযোগ ভীষণ কমে গেছে। মানুষের আশঙ্কা, মন্দার তীব্রতা আরও বাড়বে। যেহেতু বিক্রিবাটা নেই, তাই সম্পত্তি এবং পণ্য বিক্রির উপর ধার্য কর আদায়ের পরিমাণও গেছে কমে। এর ফল ভুগছে সাধারণ মানুষ, কারণ জনজীবন সুষ্ঠু ভাবে চালানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসনগুলি যে ব্যয় করত, ব্যাপক হারে তার ছাঁটাই চলছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, মনে হচ্ছে, আমেরিকার অত্যাধুনিক টেকনোলজি সমৃদ্ধ সভ্যতা যেন ফিরে যাচ্ছে মানব সভ্যতা শুরুর সেই আদিম যুগে।

ওহিও-র সিনসিনাটি এলাকার প্রশাসন রাস্তার আবর্জনা পরিষ্কার, বরফ সরানো, এমনকী গর্ত সারাইয়ের মতো অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলিও মাঝে মধ্যেই বন্ধ রাখছে। ডালাস শহরের পার্কগুলি থেকে জমে থাকা নোংরা পরিষ্কার করছে না কর্তৃপক্ষ। ফ্লিন্ট এলাকায় ৮৮ জনের দমকলবাহিনী থেকে ২৩ জনকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে, দুটি দমকল স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় ফিরে এসেছে ‘অন্ধকার যুগ’। ওয়াশিংটনের শেলটন শহরের প্রশাসন অন্যান্য এলাকার দেখাদেখি নিজের এলাকার রাস্তাগুলিতে ৮৬০টি লাইটপোস্টের মধ্যে ১১৪টিকে বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু এলাকায় বাস পরিষেবার উপর আঘাত নেমেছে। কোথাও লাইব্রেরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী ছাত্রছাত্রীরাও রেহাই পাচ্ছে না। শিক্ষক ছাঁটাই করে কম শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাবার জন্য ক্লাসগুলিতে আগের থেকে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। একটি হিসাবে অনুমান করা হয়েছে, আগামী আর্থিক বছরে স্থানীয় প্রশাসনগুলি ৫ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই করবে। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট তৈরির কাজ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমেরিকার ২৭০টি স্থানীয় প্রশাসনের মেয়রদের যে বৈঠক সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হিসাব করে দেখা যায়, স্থানীয় প্রশাসন জনসাধারণের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ৬৩ শতাংশ কাটছাঁট করছে এবং ৬০ শতাংশ করছে অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে।

গত আগস্টে মার্কিন সরকার শিক্ষকতা সহ অন্য চাকরি থেকে ছাঁটাই রুখতে ২৬ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব কংগ্রেসে পাশ করিয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার খুব সামান্য অংশই লাঘব হবে। এক গবেষক জানিয়েছেন, মহামন্দার প্রভাবে রাজস্বের হাল সত্যিই কতখানি খারাপ স্থানীয় প্রশাসনগুলি এখনও পুরোপুরি ধরতে পারেনি, কারণ ট্যাক্স থেকে যে টাকা আদায় হয়, তার হিসাব করা হয় ৩ বছর অন্তর অন্তর। ফলে সঠিক হিসাব যখন আসবে, তখনই স্থানীয় প্রশাসনগুলির রাজস্বের পরিমাণের প্রকৃত ছবি ধরা পড়বে কর্তৃপক্ষের চোখে। গবেষকটি মন্তব্য করেছেন, মন্দার পর থেকে দেখা যাচ্ছে, পার্কগুলি, এমনকী লাইব্রেরিগুলিতে পর্যন্ত বেসরকারিকরণের ঢেউ লেগেছে। প্রাইভেট কোম্পানির হাতে লাইব্রেরি লিজ দেওয়া হচ্ছে এবং মালিকরা সেখানে অবসর ভাতা বা চিকিৎসা ভাতা দেবে না, এই চুক্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করছে। বহু জায়গাতেই লাইব্রেরিগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

অর্থের অভাব মেটাতে কোথাও কোথাও জনসাধারণের ব্যবহার্য পার্কগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্থানীয় প্রশাসন তুলে দিচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ মডেলে এই কাজ চলছে। মন্টগোমারি এলাকার একটি খ্যাতনামা স্কুল ২৩ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তার গোটা পাঠক্রমটি তুলে দিয়েছে একটি প্রকাশনা সংস্থার হাতে। এই সংস্থাটি পাঠ্যবই ছাপে। সংস্থার সঙ্গে চুক্তি অনুসারে এই স্কুলের ক্লাসরুমগুলি ঐ সংস্থা তাদের শো-রুম হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে। এই ঘটনায় ধিক্কার জানিয়েছেন বহু মানুষ। তাঁরা বলছেন, এর ফলে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ঐ প্রকাশনা সংস্থার সেলসম্যানে পরিণত হবে। কিন্তু স্কুলের সুপারিটেন্ডেন্ট অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে জানিয়েছেন, এ ছাড়া তাঁর আর কিছু করার ছিল না।

এই পদক্ষেপগুলিকে মন্দার ধাক্কা সামলাতে গৃহীত সাময়িক পদক্ষেপ হিসাবে ভেবে সান্ত্বনা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ইতিমধ্যেই মার্কিন অর্থনীতির নড়বড়ে হয়ে পড়া ভিতে দীর্ঘস্থায়ী ধস সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৯ সালে মিনিয়াপোলিসে আট লেনের একটি আন্তঃরাজ্য সেতু ভেঙে পড়েছিল। এতে মারা গিয়েছিল ১৩ জন, আহত হয়েছিল ১৪৫ জন। সেই সময়ই আমেরিকার সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সংগঠন জানিয়েছিল, ওদেশে পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ টাকার ঘাটতি প্রায় ১লক্ষ ৬০ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছেছে। হুঁশিয়ারি দিয়ে ইঞ্জিনিয়াররা জানিয়েছেন, আমেরিকার সেতুগুলির এক-চতুর্থাংশই জরাজীর্ণ। তাছাড়া মাঝে মাঝেই নানা ঘটনায় পরিকাঠামোর নড়বড়ে চেহারা বেরিয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক সিটিতে বাষ্প চলাচলের পাইপ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, নিউ অর্লিন্সে নদীবাঁধগুলি কাজ করছে না।

অস্ত্র এবং পুঁজির জোরে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী দেশ হিসাবে পরিচিত আমেরিকায় শিক্ষার হাল খুবই খারাপ। বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে শুরু করে বিজ্ঞান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, সবেতেই এ দেশ যথেষ্ট পিছিয়ে। এক সময় মোট জনসংখ্যার মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীদের শতাংশের বিচারে আমেরিকা বিশ্বের মধ্যে এক নম্বর স্থানে ছিল। আজ তার স্থান দ্বাদশ। মাথাপিছু ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহারের দিক দিয়ে ২০০১ সালে গোটা বিশ্বে আমেরিকা ছিল চতুর্থ স্থানে। এখন ৩০টি দেশের মধ্যে তার স্থান ১৫ নম্বরে।

আগেই বলা হয়েছে, বেকারির হারও যথেষ্ট বেশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। একটি হিসাব অনুযায়ী বেকারির হার ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। মার্কিন সেন্সাস ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে সে দেশে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারতের সঙ্গে ১ হাজার কোটি ডলারের চুক্তি করেছেন এবং তার ফলে ভারতীয় পুঁজি খাটিয়ে ৫০ হাজার মার্কিন যুবক-যুবতীর কাজের ব্যবস্থা হবে বলে সংবাদপত্রগুলিতে প্রবল প্রচার হয়েছে। ভাবটা এমন যেন, প্রেসিডেন্ট দেশের বেকারত্ব ঘোচাতে বিরাট একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু আমেরিকার বাস্তব অবস্থা কী? তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, সেখানে ২০০৭-এর ডিসেম্বর থেকে প্রতি সপ্তাহেই গড়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। এও হল সরকারি হিসাব। বেসরকারি হিসাবগুলি বেকারত্বের আরও ভয়ঙ্কর চেহারার বর্ণনা দিচ্ছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস বলছে, ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে গত ৩৫ মাসে ৭৫ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছে। বহু মানুষ আংশিক কর্মহীন, তারা পূর্ণ সময়ের কাজ পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে মোটামুটি ভাবে বলা যায়, কর্মহীনতা কিংবা আংশিক কর্মহীনতা দূর করতে প্রতি মাসে আমেরিকায় ৩ লক্ষেরও বেশি কাজ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ওবামার বহুল প্রচারিত ৫০ হাজার কর্মসংস্থান যে সে প্রয়োজনের একাংশও মেটাতে পারবে না, তা বলাই বাহুল্য। বিভিন্ন সংস্থা তাদের সংগৃহীত তথ্যে দেখিয়েছে, মানুষ যত বেশি দিন ধরে কর্মহীন থাকে, ততই কমে আসে তাদের নতুন করে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা। দীর্ঘদিন কাজ না করায় দক্ষতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে মালিকরা তাদের কাজে নিতে চায় না। আবার অনেক সময়, কেন তাদের কাজ নেই, এ নিয়েও মালিকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। ফলে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কর্মহীন এইসব মানুষ অনেক সময়ই অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। আমেরিকায় কোনও ভাবেই এই ধরনের মানুষের সংখ্যা কমানোর কোনও উপায় নেই, কারণ সেখানে বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই হল কর্মহীনতার এই সমস্যা।

মার্কিন সমাজ আজ বীভৎস বৈষম্যে ভরা। বস্তুত মধ্যবিত্ত অংশের মানুষের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে ওদেশে। আছে মুষ্টিমেয় কিছু ধনী চূড়ামণি, আর আছে অসংখ্য দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষ। মহামন্দার হাত থেকে রেহাই দিতে বৃহৎ পুঁজিপতিদের পায়ে মার্কিন সরকার এ পর্যন্ত ১ লক্ষ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ ভেট দিয়েছে, অথচ কর্মসংস্থানের কোনও দায়িত্ব নেয়নি শিল্পপতিরা। সম্প্রতি ২ নভেম্বরের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পরেই আবার তাদের ধার মেটাতে মার্কিন রাজস্ব থেকে ৬০ হাজার কোটি ডলার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছে আমেরিকার সরকার। যদিও এই সাহায্য দেওয়ার বিনিময়েও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার কোনও শর্ত পুঁজিপতিদের উপর চাপানো হয়নি। বোঝাই যায়, ভারত-মার্কিন ১ হাজার কোটি ডলারের চুক্তিও কর্মসংস্থানের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করতে পারবে না, এর বেশিটাই মালিকদের পকেটে ঢুকবে মুনাফা হিসাবে। সব দেখেশুনে ‘বিট্রেয়িং দি আমেরিকান ড্রিম’-এর লেখক অ্যারিয়ানা হাফিংটন মন্তব্য করেছেন, ‘ভেঙে পড়া মধ্যবিত্ত মানুষের চেহারা দেখে আমার মনে হয়, আমেরিকা শীঘ্রই তৃতীয় বিশ্বের দেশে পরিণত হতে চলেছে।’ তাঁর মতে, তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য হল, সেখানে সমাজের উঁচু তলায় কিছু মানুষ আছে, বাকিরা পড়ে আছে একেবারে নিচের তলায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনি বলেছেন, আমেরিকায় ‘মধ্যবিত্তের স্বপ্ন’ বলে একটি শব্দবন্ধ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। সেই স্বপ্ন বলত, পরিশ্রম কর, জীবনে উন্নতি কর, তোমার সন্তান-সন্ততি আরও উন্নতি করবে। সে স্বপ্ন আজ ভেঙে চুরমার। এখন চোখের সামনে দেখতে হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে, কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। শিক্ষা ও পরিকাঠামো খাতে অর্থ ছাঁটাই এই সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলবে।

বস্তুত এ সমস্যার জন্য শুধু সাম্প্রতিক মহামন্দাই যে দায়ী নয়, আমেরিকার বহু চিন্তাশীল মানুষই এখন সেকথা বলছেন। সে দেশে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার, গত এক দশকের বেশি সময় ধরে পড়তি। মন্দার কারণে চাকরির সুযোগ আরও কমে গেছে। জনসংখ্যা বেড়েছে, অথচ কাজের সুযোগ বাড়েনি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দৌলতে শ্রমিক-কর্মচারীদের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ উৎপাদন করছে। কিন্তু তাদের মজুরি বিশেষ বাড়েনি। অধিক উৎপাদনশীলতার সুবিধা মুনাফা হিসাবে মালিকের পকেটে ঢুকেছে। কাজ পাওয়ার জন্য শুধু নিজের দেশের নয়, ইউরোপ, এশিয়া সহ অন্যান্য দেশের কম মজুরির শ্রমিকদের সঙ্গেও লড়তে হচ্ছে বলে মার্কিন শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য জোরদার লড়াইও আজ করতে পারে না। আমেরিকার বহু মানুষই আজ বুঝতে পারছেন যে, সে দেশের সাধারণ মানুষের সার্বিক দুরবস্থার জন্য সরকারের বৃহৎ পুঁজিপতি তোষণকারী ভূমিকাই দায়ী। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং তাঁর পূর্ববর্তী রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্টের কর্মনীতির সমালোচনা করে তাঁরা বলছেন, উভয় সরকারই বৃহৎ পুঁজিপতিদের দুরবস্থা সামাল দিতে বিপুল সরকারি অর্থ বরাদ্দ করেছে। উভয় সরকারেরই লক্ষ্য ছিল, কেবল মার্কিন শেয়ার বাজারের স্বাস্থ্য ফেরানো। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের দিকে এঁরা কেউই ফিরেও তাকাননি। ফলে মার্কিন জনসাধারণের জীবনের আজ এই চরম দুরবস্থা।

আমাদের দেশের যে সব মানুষ আমেরিকাকে মনে করেন ‘সব পেয়েছির দেশ’, এ লেখা হয়ত তাঁদের হতাশ করবে। সাথে সাথে এ দেখেও তাঁরা আশ্চর্য হবেন যে ধনীকুল চূড়ামণিদের দেশ আমেরিকার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে গরিব দেশ ভারতের ভিতরের চেহারার কী অদ্ভুত মিল! আসলে বিশ্বের প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেরই আজ এক হাল। জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারি বরাদ্দ ব্যাপক হারে ছাঁটাই করে পুঁজিমালিকদের মুনাফার থলিটি অটুট রাখা — পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার কর্ণধার সরকারগুলি প্রতিটি দেশে আজ এই নীতি নিয়েই চলছে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ক্রমাগত বাড়বৃদ্ধি হচ্ছে, আর শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থানের সুযোগ হারিয়ে মরছে ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ মানুষ।

(তথ্যসূত্র ঃ নর্থস্টার কম্পাস, নভেম্বর ’১০ ও দি হিন্দু, ২২ নভেম্বর, ’১০)

বিশেষ পার্টি কংগ্রেসে দেশব্যাপী আন্দোলন তীব্র করার ডাক

একের পাতার পর

শক্তিশালী করা।

সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ঠিক কী উদ্দেশ্যে এই বিশেষ পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করা হয়েছে, তা আপনারা দলের প্রবীণ নেতা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে শুনলেন। কিন্তু পার্টি কংগ্রেস যেহেতু পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি, তাই কেন্দ্রীয় কমিটি আরও কিছু বিষয় নিয়ে এই পার্টি কংগ্রেসে আলোচনার সুযোগ নিতে চায়। আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ সারা জীবন সর্বহারার আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন। ১৯৪৮ সালে পার্টির প্রতিষ্ঠা কনভেনশনের ঠিক পর পরই তিনি বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে একটি অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ রেখেছিলেন, যা তাঁর অসাধারণ প্রতিভার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে আছে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫ বছর। আমাদের পার্টি বলতে তখন কয়েকজন মানুষের একটা ছোট্ট গ্রুপ মাত্র। সে সময়টা ছিল কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রবল অগ্রগতির সময়। দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট সামরিক শক্তিকে পরাজিত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ীর মুকুট তখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের মাথায়, চীনের বিপ্লব বিজয়ের দোরগোড়ায়। গোটা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে, বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ চলছে, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শিবির ভয়ে কম্পমান। ঐ সময়ে সাম্যবাদী আন্দোলনে ভবিষ্যতে কোনও সঙ্কট সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা কল্পনা করাও প্রায় অসম্ভব ছিল। ওইরকম একটা সময়ে, আমাদের মহান নেতা বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের গৌরবকে স্বীকার করেই, মহান শিক্ষক স্ট্যালিনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই, সাম্যবাদী আন্দোলনে দ্বান্দিক চিন্তাপদ্ধতির পরিবর্তে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির গুরুতর ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। পরবর্তী ঘটনাবলী তাঁর হুঁশিয়ারিকে ভবিষ্যৎবাণীর মতোই প্রমাণ করেছে। সাম্যবাদী আন্দোলনের উপর আরও আক্রমণ ঘটেছে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব এসে শুরু করে স্ট্যালিনবিরোধী মিথ্যার অভিযান। সেই ঘোর সঙ্কটজনক মুহূর্তে বিশ্বে কমরেড শিবদাস ঘোষই সর্বপ্রথম বললেন, স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে মসীলিপ্ত ও অবমাননা করার অর্থ লেনিনবাদকেই অস্বীকার করা, যা শেষপর্যন্ত সাম্যবাদী আন্দোলনে বন্যার মতো শোধনবাদ প্রবেশের দরজা খুলে দিয়ে সমাজতন্ত্রকেই বিপন্ন করবে। তিনি এই সর্বনাশা শোধনবাদী চিন্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন, সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আদর্শগত হাতিয়ারেরও সন্ধান তিনি দেন। সে সময় বিশ্ব দূরের কথা, এই ভারতবর্ষে, এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর কোনও পরিচিতি ছিল না। আমৃত্যু তিনি সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী আদর্শকে সমস্ত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য লড়াই করেছেন।

আপনারা জানেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যক্ষ পরিচালনাতেই আমাদের পার্টি কখনও এককভাবে, কখনও যৌথভাবে বহু গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তুলেছে। জরুরি অবস্থার সময়ে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমাদের দেশের মেহনতি জনতার প্রতি এক উদাত্ত আহ্বান জানান, দলের নেতা-কর্মীদেরও সে জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর, আপনারা জানেন, প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠতম সহযোদ্ধা কমরেড নীহার মুখার্জী আন্তর্জাতিকতাবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন রাখেন। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট শক্তিগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমরা এগিয়েছি।

মহাজাতি সদনে প্রতিনিধিদের একাংশ

জাতীয় ক্ষেত্রে বহু রাজ্যেই কেন্দ্রীয়, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে আমরা বহু আন্দোলন গড়ে তুলেছি। কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুর পর বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই বিশেষ কংগ্রেসে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির উপর দুটি প্রস্তাব পেশ করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটি চায় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও কার্যকরী করার জন্য, দেশের মধ্যে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম জোরদার করার জন্য পার্টির কী কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সে বিষয়ে আপনারা সুনির্দিষ্ট পরামর্শ ও প্রস্তাব দেবেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর এবং সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর এককেন্দ্রীক বিশ্বের স্বপ্নে আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্বের পুঁজিপতি শ্রেণী যে উল্লাসে মেতে উঠেছিল, প্রবল অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে তা মিলিয়ে যেতে দেরি হয়নি। আমেরিকা ও ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিও প্রবল শ্রমিক বিক্ষোভে বারবার কেঁপে উঠছে। সর্বত্রই স্লোগান উঠছে 'পুঁজিবাদ নিপাত যাক'। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন মানুষ আবার একত্রিত হচ্ছে। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের যে ডাক প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে তাতে সুনির্দিষ্ট কী কী কর্মসূচি নেওয়া যায় সে সম্পর্কে প্রতিনিধিরা তাঁদের অভিমত রাখেন। কীভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ এবং নিজ নিজ দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়, কীভাবে তাকে একটি প্ল্যাটফর্মের মধ্যে নিয়ে আসা যায় এবং শেষ পর্যন্ত একটি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে তোলা যায়, তা নিয়েও প্রতিনিধিরা মতামত রাখেন।

জাতীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। দ্বিতীয় দিনে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনায় ২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদের আবেগপূর্ণ আলোচনায় দেখা যায়, প্রতিটি রাজ্যেই দল সাংগঠনিক ক্ষমতা অনুযায়ী জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও কেরল, কর্ণাটক, হরিয়ানা, ওড়িশা, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে যেমন গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে দ্রুত সাংগঠনিক বিকাশ ঘটছে, তেমনই গুজরাট, রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে হলেও গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের মধ্যে পার্টি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করছে। ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধিরা জানান, ঐ রাজ্যে মাওবাদীরা একদিকে খুন-ব্ল্যাকমেলিং, অপরদিকে শাসকশ্রেণী ও শাসক দলগুলির সাথে যোজসাজশের মধ্য দিয়ে যে সন্ত্রাসের রাজনীতি কায়েম করেছে তার সঙ্গে মাও সে তুঙের চিন্তার কোনও সম্পর্ক নেই, তা শুধু গণআন্দোলনের পরিবেশকেই বিঘ্নিত করছে। আশার কথা, রাজ্যের গরিব আদিবাসী মানুষ আজ সাহসের সাথে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতৃত্বে একের পর এক গণআন্দোলনে সামিল হচ্ছে।

প্রতিটি রাজ্য থেকেই প্রতিনিধিরা তাঁদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কংগ্রেসে উপস্থিত করেন। তাতে দেখা গেল, প্রতিটি রাজ্যেই শাসক দলগুলি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এই সমস্ত দলই, সে জাতীয় বা আঞ্চলিক যা-ই হোক, সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়েছে। কোনও রাজ্যেই সিপিএম বা সিপিআই আজ আর আন্দোলনের শক্তি হিসাবে দাঁড়িয়ে নেই। যেখানে একদিন তাদের কিছু শক্তিও ছিল, আজ তা তলানিতে এসে ঠেকেছে। কোথাও কোথাও শাসক বুর্জোয়া দলগুলির লেজুড় হিসাবেই এই দলগুলি টিকে আছে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় নানা কৌশল চালিয়ে যাচ্ছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে তাদের কৃষক বিরোধী ভূমিকা, বুর্জোয়া দলগুলির মতোই আন্দোলনকারীদের উপর নৃশংস পুলিশি অত্যাচার, দলীয় এবং ভাড়াটে ক্রিমিনাল দিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের উপর ধর্ষণ-অত্যাচার তাদের বামপন্থী ইমেজটুকুকেও মুছে দিয়েছে। বিপরীতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সর্বত্রই গণআন্দোলনের একমাত্র শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দলের কর্মীদের লড়াকু মনোভাব, উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম জনগণের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। যেখানেই শোষণ, অত্যাচার, যেখানেই উচ্ছেদ সেখানেই দলের কর্মীরা নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে গড়ে তুলছেন প্রতিরোধ কমিটি, গণকমিটি। বুর্জোয়া দলগুলি তো বটেই, দেশের তথাকথিত বড় বামপন্থী দলগুলিও শোষিত মানুষকে মিছিল-মিটিং ও ভোটে ব্যবহার ছাড়া কোনও দিন এভাবে সরাসরি আন্দোলনের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত নিতে ময়দানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেনি। কারণ, তারা চায়নি জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম হোক।

দল তথা কর্মীদের গণসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রাম গড়ে তোলার এই বিশেষ পরিস্থিতির যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী দলের সকল স্তরে ত্রুটি-দুর্বলতাকে নির্মূল করে উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য দলের অভ্যন্তরে যে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন দলের প্রতিটি নেতা ও কর্মীরা যাতে সেই সংগ্রামে সর্বান্তকরণে সামিল হতে পারে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পুনরায় সে ব্যাপারে আহ্বান জানান।

দলের সংবিধানে কিছু সংশোধনীর জন্য প্রস্তাব পেশ করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। সমর্থন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সি কে লুকোস। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এরপর সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কমরেড প্রভাস ঘোষের নাম প্রস্তাব করেন কমরেড রণজিৎ ধর। সমর্থন করেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করান।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ওঠার ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন।

নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আপনারা আজ আমাকে যে দায়িত্ব দিলেন, আমি জানি, তা কোনও ব্যক্তিবিশেষের

আটের পাতায় দেখুন

ফ্রান্সের মতোই আন্দোলনে উত্তাল ব্রিটেন

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ পুঁজিবাদী দেশ ব্রিটেন, যে দেশের অর্থনীতিবিদ ক্রিস্টোফার পিসারাইডস চাকরি ধাঁধার 'জট' খুলে সম্প্রতি অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, সেই দেশের অর্থনীতিতেই কিনা মন্দার আতঙ্ক! আর তা এতটাই যে, ব্যয়সঙ্কোচের জন্য সরকারকে জনকল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ কাটছাঁট করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণে। একই সাথে কলে-কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। শিক্ষক-গবেষকদেরও ছাঁটাই করা হচ্ছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বিচারে কর্মী সংকোচন করা হচ্ছে। বেসরকারি ক্ষেত্রগুলি এই সুযোগে কর্মচারীদের উপর শোষণ তীব্রতর করছে। সবচেয়ে বেশি আক্রমণ নেমে আসছে শিক্ষাক্ষেত্রে। উচ্চশিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ ব্যাপকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্রাছাড়া ফি বাড়ানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এর প্রতিবাদে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দেশের সর্বত্র চলছে বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ, সরকারি দপ্তর ঘেরাও। এতে সামিল হয়েছে ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মচারী সহ আপামর জনসাধারণ। ১২-১৪ বছরের কিশোর ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনের প্রথম সারিতে। স্বাভাবিকভাবেই গোটা বিশ্বের মেহনতি জনতার চোখ এখন ব্রিটেনের দিকে।

কেন আজ আন্দোলনে উত্তাল ব্রিটেন? পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক বুঝতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে এক মাস আগে। সে সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সে ব্রিটিশ চ্যান্সেলর জর্জ অসবোর্ন দেশবাসীর উদ্দেশে এক বিস্ফোরক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'সবার আগে জোর দিতে হবে ব্যয়সংকোচে। সে জন্য সামাজিক সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়সংকোচ করতে হবে। এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির থেকে পাঁচ লক্ষ কর্মী ছাঁটাই করা হবে।' সরকার ক্ষমতায় বসার পর ৬ মাস অতিক্রান্ত হলেও নির্বাচনে যা যা প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল, তার কোনওটাই পূরণ করেনি। এ দেশের ভোটবাজ দলগুলির নেতারা যা করেন, ব্রিটেনেও তাই চলছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জন পরিষেবা এবং চাকরিক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দেবার প্রতিশ্রুতিগুলি এক ফুৎকারে তাঁরা উড়িয়ে দিচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই এর বিরুদ্ধে রোষে ফেটে পড়ছে মানুষ।

সরকারের এই ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণের ফলে কর্মচারীদের আর্থিক সংকট ও চাকরি হারানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে তারা ফুঁসছে, অন্যদিকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় সারা ব্রিটেন জুড়ে ছাত্ররা তুমুল আন্দোলন শুরু করেছে। ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ-লিবারাল ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে সাধারণ মানুষ। সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁরা বলছেন, সরকার শুধু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিই ভঙ্গ করেনি, একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে, প্রতারণা করছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

বিক্ষোভের বারুদ ফেটে পড়ছে দেশের সর্বত্র। সরকারের আর্থিক নীতির প্রতিবাদ জানাতে লন্ডনের রাস্তায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয় ১০ নভেম্বর। টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৫০ হাজার ছাত্র রাজপথ জুড়ে বিক্ষোভ দেখায়। লন্ডনে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির সদর দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এ রাজ্যে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী ট্রেড ইউনিয়নগুলির বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষিপ্ত সর্বস্বান্ত শ্রমিকরা যেমন পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেয় মাঝে মধ্যে, লন্ডনেও একই ঘটনা ঘটছে। ১১ হাজারের বেশি ছাত্র ক্লাস বয়কট করেছে। রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ চলছে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে। ছাত্রীরাও পিছিয়ে নেই। তারাও বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র পুলিশের সাথে লড়াই করছে। ১১ বছরের কম বয়সী ছাত্ররা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা বিক্ষোভ দেখিয়েছে ২৬ নভেম্বর। এই ঘটনা আন্দোলনকারীদের মনোবল বাড়িয়ে তুলেছে। শাসক দলের নেতারা সন্ত্রস্ত হয়ে আন্দোলন মোকাবিলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ছাঁটাই করার ভয় দেখিয়ে, জেলের ভয় দেখিয়েও নিরস্ত্র করতে পারেনি শ্রমিক এবং ছাত্রদের। পুলিশের সাথে ব্যারিকেড ফাইট করছে নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীরা। অধ্যাপকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। শ্রমিকরা কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে ব্যারিকেড ফাইটে যোগ দিয়েছে। গোটা ব্রিটেন জুড়ে আন্দোলনের ঝড় আতঙ্কিত করে তুলেছে শাসকগোষ্ঠীকে। দেশের সংবাদপত্রগুলি এই আন্দোলনকে 'শাসকশ্রেণীর পক্ষে ভয়াবহ বিপদ' বলে বর্ণনা করেছে।

এ বিষয়ে ব্রিটেনের মালিকশ্রেণীর পত্রিকা গার্ডিয়ান লিখছে, ছাত্রদের বিশাল মিছিল এবং টোরিদের সদর দপ্তর অভিমুখে তাদের আগ্রাসনকে কোনওভাবেই খাটো করে দেখা উচিত নয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই প্রতিবাদ সাধারণ মানুষেরও জোরালো সমর্থন পেয়েছে। ঐ পত্রিকাতেই ছাত্র আন্দোলনের এক নেতা বলেছে, 'সবে তো শুরু হয়েছে'। আর একটি পত্রিকা লিখছে, 'এই আন্দোলন যুক্ত সরকারের কাছে এই বার্তাই দিচ্ছে যে তাদের ভূমিকা দেশের ছাত্র ও শ্রমজীবী মানুষকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছে। যে জন্য তাঁরা সরকারি ব্যয়সংকোচের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে পথে নামবে অথবা ধর্মঘটে সামিল হবে'। অপর এক পত্রিকা দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট লিখছে, 'এতদিন কখনও কখনও কোনও জায়গায় স্থানীয় স্তরে বেতন বা কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে শ্রমজীবী মানুষ, কিন্তু এবারের ছাত্রদের আন্দোলন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের'। এক সিনিয়র পুলিশ অফিসার আন্দোলনকারীদের দেখে মন্তব্য করেছেন, 'এটা সামাজিক অস্থিরতার নতুন যুগ'। কিন্তু এই অস্থিরতা যে পুঁজিবাদেরই এক অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য এবং এর থেকে যে পুঁজিবাদের পরিত্রাণ নেই, মার্কসবাদীরা বহু আগেই তা দেখিয়েছেন।

সরকার উচ্চ শিক্ষায় ব্যয় সংকোচনের যুক্তি হিসাবে বলছে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমকক্ষ করতে তাদের এই পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। ভারতীয় শাসকদের মতো একই সুর ওদেশের শাসকদেরও। এই যুক্তি কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? অধ্যাপকরা প্রশ্ন তুলেছেন, যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অর্থের অভাবে এমনিতেই ধুঁকছে, তখন বিপুল পরিমাণে বরাদ্দ হ্রাস ছাত্রদের কি আরও সংকটে ফেলবে না? এর আগেও তো ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম ছিল সারা বিশ্বজুড়ে, তখন তো বরাদ্দ হ্রাসের দরকার পড়েনি। আর একটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে ওদেশের সরকারকে। একটা গণতান্ত্রিক সরকারের তো মৌলিক দায়িত্ব সকলকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া। তা না করে সরকারি বরাদ্দ হ্রাস করে ছাত্রদের অধিক অর্থ দিয়ে শিক্ষা কিনতে বাধ্য করতে পারে কি সরকার? তাতে শিক্ষার অধিকার থেকেই কি বঞ্চিত হবে না সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা?

বলা বাহুল্য, এ দেশের শাসকদের মতোই ওদেশে শাসকরা এর উত্তর এড়িয়ে গিয়ে জনসাধারণকেই ত্যাগ স্বীকার করার পরামর্শ দিয়েছেন। দেশবাসীকে বলেছেন, সাময়িকভাবে কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিলেই ব্রিটেন আবার স্থিতিশীল অর্থনীতির মুখ দেখবে। অর্থাৎ মুখে না স্বীকার করলেও তাদের বলতে হচ্ছে অর্থনীতি আজ চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত। যদিও তাদের বক্তব্য অনুযায়ী তা নিতান্তই সাময়িক। কিন্তু এই সংকট যে কত তীব্র তা প্রমাণিত হচ্ছে সরকারের জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় বরাদ্দ হ্রাসের বহর দেখে। অর্থনৈতিক মন্দার অজুহাত দিয়ে দেশে দেশে পুঁজিপতিশ্রেণীর দালাল সরকারগুলি শ্রমিক শোষণ আরও জোরদার করছে, শ্রমিক ছাঁটাই করছে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বরাদ্দ হ্রাস করছে। কারণ, ক্ষমতায় থাকতে গেলে যে কোনও বুর্জোয়া দলকেই পুঁজি মালিকদের কৃপাধন্য হতে হয়। এদের আশীর্বাদ না পেলে ক্ষমতায় আসা যায় না। আর মালিক-শ্রমিকের স্বার্থ যেহেতু একত্রে দেখা যায় না, তাই পুঁজিপতিদের মুনাফা অটুট রাখতে মেহনতি মানুষের উপর আক্রমণ না করে শাসকদের উপায় নেই। ব্রিটেনে ক্ষমতাসীন টোরিরা তাই নির্বাচনের আগে জনদরদী যত প্রতিশ্রুতি দিক না কেন তা পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় আমাদের দেশের বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি দল কংগ্রেস, বিজেপি ও সিপিএমের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ দেখা। মরতে বসা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই চরম সঙ্কটের দিনে তাই একদা শিল্পবিপ্লবের পীঠস্থান ইংল্যান্ডেও অবাধে চলছে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই, জনতার জন্য সরকারি বরাদ্দ হ্রাস।

ব্রিটেনের শাসকরা আন্দোলনের গণরূপ দেখে আজ ভীত। বস্তুত ফ্রান্স সহ গোটা ইউরোপে আন্দোলনের চেহারা দেখে শাসক শ্রেণী আজ আতঙ্কিত। তারা জানে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হলে তা তাদের শাসনের ভিত নাড়িয়ে দেবে, এমনকী ভেঙেও দিতে পারে। বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলে দলে ছাত্র বেরিয়ে এসে রাজপথে মিছিল করে সরকারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এই আন্দোলনকে 'অভাবনীয় ছাত্র বিক্ষোভ' বলে অভিহিত করছেন ছাত্রনেতারা। অনেকে বলছেন, ১৯৬৮ সালের মতো গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে টিউশন ফি বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন।

আতঙ্কিত শাসক গোষ্ঠী আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা করছে। অন্যান্য দেশের অত্যাচারী শাসকদের মতো ব্রিটেনের সরকারও দমন-পীড়ন নামিয়ে আনছে আন্দোলনের উপর। কিন্তু গুলি, টিয়ার গ্যাস চালিয়ে বা আন্দোলনকারীদের জেলে পুরেও আন্দোলনের তীব্রতা কমাতে পারেনি তারা। প্রতিদিনই নতুন নতুন জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। তারা জানে না আন্দোলনের বারুদ আগুনের স্পর্শে ক্রমশই ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। শত অত্যাচার নামিয়েও তা নেভানো যায় না।

প্রতিদিন বিদেশে পাচার হয় ২৪০ কোটি টাকা

ভারতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ চরম দুর্নীতির পাঁকে

শাসক ও বিরোধী দলগুলির চরম দুর্নীতি নিয়ে দেশ যখন তোলপাড়, যখন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-মন্ত্রীদের নাম মুখে আনতেও ভারতবাসী ঘৃণা বোধ করছে, তখন কতিপয় নেতা আসরে নেমে গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে জনগণকে আশ্বস্ত করছেন। বিজেপি-র লালকৃষ্ণ আদবানি সহ কংগ্রেসের কিছু নেতা ভয়ানক দুর্নীতির এই পরিবেশে মানুষকে ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর আস্থা রাখতে বলেছেন এবং এই 'কঠিন সময়' ভারত যে 'গণতন্ত্রের জোরে'ই পার হয়ে যেতে পারবে, সে বিষয়ে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ভারতের বুর্জোয়া গণতন্ত্র যদি এতই মহান এবং শক্তিশালী হয়, তাহলে কী করে কেন্দ্র থেকে রাজ্য পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর তাবড় তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা হেলায় শত-সহস্র কোটি টাকা নয়ছয় করার সাহস পাচ্ছেন এবং করে যাচ্ছেন? গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন। আজকের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে কোথায় সেই জনগণ? দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া এই জনগণের জন্য আর কোনও ভূমিকাই রাখেননি মহান গণতন্ত্রীরা!

এইসব গণতন্ত্রের ভেকধারীদের কাছে আরও প্রশ্ন, হে মহান দেশনায়করা, শুধু নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতিই নয়, স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিদিন যে ২৪০ কোটি টাকার উপর ভারতীয় অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, তা কি 'সদা জাগ্রত' গণতন্ত্রের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি? এ সম্পর্কে সম্প্রতি যে রিপোর্টটি বেরিয়েছে, তা তো ভয়ানক! অথচ, কেন্দ্র-রাজ্যের কোনও মহান গণতন্ত্রীকেই তো সে বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না!

জানলে অনেকেই হয়ত আঁতকে উঠবেন যে, প্রতি ২৪ ঘন্টায় ভারত থেকে গড়ে ২৪০ কোটি টাকা বেআইনি ভাবে বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৮ থেকে ২০০৮ — এই ৫০ বছরে এই বেআইনি পাচারের পরিমাণ ৯.৭ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে আবার, ৫.৭ লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়েছে মাত্র ৮ বছরে — ২০০০ থেকে ২০০৮ সালে। এই পাচারের পিছনে রয়েছে দুর্নীতি, ঘুষ, কাটমানি, ক্রিমিনাল কার্যকলাপ এবং বেআইনি ভাবে অর্জিত সম্পত্তি বিদেশে পাঠিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া। এসব তথ্য প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

এই রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র ২০০৪-'০৮ — এই চার বছরে ভারত থেকে বেআইনি অর্থ পাচার হয়েছে ৪.৩ লক্ষ কোটি টাকা, যা ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারিতে নয়ছয় হওয়া অর্থের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি। অথচ এই দেশের নেতা-মন্ত্রীরাই বলেন যে, ভারতে নাকি পুঁজির সঙ্কট, সেজন্য বিদেশি পুঁজি ও বিপুল ঋণ ছাড়া ভারতবর্ষে শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে না। অথচ ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০০৮ সালের শেষ পর্যন্ত ভারতের যে পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ ছিল (২৩০ বিলিয়ন ডলার), পাচার হওয়া বিপুল অর্থ দেশে থাকলে ঐ ঋণ মিটিয়েও অর্থ হাতে থাকত।

প্রতিদিন ২৪০ কোটি টাকা বিদেশে গায়েব হয়ে যাওয়ার এই অঙ্কটাও নাকি সঠিক হিসাব নয়। এর মধ্যে কালোবাজারি, পণ্যের রপ্তানি-আমদানি মূল্য নির্ধারণে কারচুপি, তথ্যের অভাব এসব রয়েছে। পুরো হিসাব পেলে দেখা যেত, এর পরিমাণ বেশ কয়েক গুণ বেশি। আরও আশ্চর্যজনক তথ্য হল, এই বেআইনি পাচারের মধ্যে প্রধান অংশটা হচ্ছে বেআইনি ভাবে অর্জিত অর্থ, অর্থাৎ কালো টাকা। যে কারণে দেশের মধ্যে কোন উৎস থেকে এই টাকাগুলো পাচার হয়েছে, ব্যাঙ্ক বা অন্য সরকারি হিসাবের খাতায় তার আইনি হদিশ পাওয়া যায় না। ঐ সংস্থার হিসাবে মোট পুঁজি পাচারের পরিমাণ ভারতের ২০০৮-এর জিডিপি-র ১৬.৬ শতাংশ প্রায়।

ভারতে যে কালো টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি চলছে, তার অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে এই বেআইনি পুঁজি পাচার। অনেক গবেষক হিসাব করে দেখিয়েছেন, ভারতে কালো টাকার এই সমান্তরাল অর্থনীতি মোট জিডিপির প্রায় ৫০ শতাংশ। আবার গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির হিসাবে এই ৫০ শতাংশের ৭২ শতাংশই দেশের বাইরে জমা আছে।

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

কাশ্মীর পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা সভা

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। মঞ্চে রয়েছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ (বক্তার বাম দিকে) সহ পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ।

কাশ্মীর পরিস্থিতি নিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২৮ নভেম্বর সকালে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনা করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সভার শুরুতে, দলের দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য, জন্মসূত্রে কাশ্মীরের মানুষ কমরেড প্রাণকুমার শর্মা সংক্ষেপে ও সহজ হিন্দিতে কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

মুখ্য বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ভারতীয় সেনা ও আধা-সেনাবাহিনীর লাগাতার অত্যাচারে কাশ্মীরের জনজীবনে কী ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার এক মর্মস্পর্শী ছবি তুলে ধরে দেখান যে, শুধু আজকের কংগ্রেস সরকার নয়, স্বাধীনতার পর থেকে যে যে সরকার কেন্দ্রে এসেছে কোনও সরকারই কাশ্মীরের জনগণের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা দূরের কথা, সহানুভূতিও দেখায়নি, প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেনি। চরম স্বৈরাচার ও তার সাথে শাসকগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতিকে ঘোরালো করেছে। কাশ্মীরের জনগণের মানসিক ক্ষত আজ এতই গভীর যে, তা শুধু কিছু প্রলেপের দ্বারা দূর হবে না। তাদের মন জয় করা আজ অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য, কিন্তু অসম্ভব নয়। এ কাজটি কেবল আমরা, যথার্থ কমিউনিস্টরাই করতে পারি, কারণ কমিউনিস্টরাই একমাত্র উন্নত, বৈষম্যহীন ও জাতিগত নিপীড়নমুক্ত ভারত গড়ার জন্য লড়াই করছে। তিনি এ কথাও স্বীকার করেন যে, কাশ্মীরের জনগণের প্রতি ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যেভাবে সংগঠিত প্রতিবাদ গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, আমাদের দলও তা পারেনি। এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য তিনি দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আবেদন জানান।

(পূর্ণ আলোচনাটি পরে প্রকাশিত হবে)

আন্দোলন তীব্র করার ডাক

ছয়ের পাতার পর

দায়িত্ব নয়, এ এক যৌথ দায়িত্ব। পলিটব্যুরো, কেন্দ্রীয় কমিটি, আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, যে সমস্ত কর্মীরা এখানে নেই এবং দেশের শ্রেণী সচেতন সর্বহারা শ্রেণী-সকলের পরামর্শ এবং সহযোগিতার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব। আমি আপনাদের এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আপনারা যে দায়িত্ব আমাকে দিলেন, তা পালন করতে পারার প্রয়োজনীয় মান অর্জনের জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতার ভিত্তিতে আমার সংগ্রাম জারি রাখব শুধু নয়, তা আরও তীব্র ও গভীর করব। কমরেড প্রভাস ঘোষ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, তিরিশ বছরেরও কম বয়সী মাত্র ৬ জন সহযোদ্ধাকে নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ একদিন যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তা কী ইতিহাস তৈরি করেছে তা আপনারা সকলেই উপলব্ধি করছেন। আজ আপনারা এখানে বিরাট সংখ্যায় উপস্থিত আছেন। আপনারা যদি দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এক মানুষের মতো দাঁড়াতে পারেন তা হলে আমরা কী করতে পারি তাও আপনারা সকলেই বোঝেন। আপনারা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে উপলব্ধি করুন, তাকে জীবনে প্রয়োগ করুন। তাঁর শিক্ষা আমাদের অস্তিত্বের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকুক।

কমরেড সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের পর আন্তর্জাতিক সঙ্গীত এবং 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ', 'পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'মহান আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে বিশেষ কংগ্রেসের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

কংগ্রেস শেষে প্রতিনিধিরা ফিরে গেলেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে। সেই অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করতে আগামীদিনে তাঁরা ছড়িয়ে পড়বেন গোট দেশ জুড়ে, শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুক্তির সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণআন্দোলন ও শ্রেণীর সংগ্রামকে তীব্রতর করার কাজে।

প্রতিদিন বিদেশে পাচার হয় ২৪০ কোটি টাকা

সাতের পাতার পর

ফলে কালো টাকার মাত্র ৩৮ শতাংশই দেশের মধ্যে রয়েছে।

ঐ সংস্থার রিপোর্ট দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এনেছে — ১) ১৯৯১ সালের নয়া আর্থিক উদারনীতি বা তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হওয়ার পরই এই পুঁজি পাচার বিপুল পরিমাণে বেড়েছে, ২) ধনকুবের ব্যক্তি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের কোম্পানিগুলোই হচ্ছে এই বেআইনি পুঁজি পাচারের প্রধান হোতা। অর্থাৎ তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার অর্থনীতির কী সংস্কার করেছে, সাধারণ মানুষের জীবনে কী উন্নয়ন এনেছে জানা না থাকলেও, ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে যে কারচুপি ও কালোবাজারির দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে, তাতে কোনও সংশয় নেই। ছদ্মবেশি কোম্পানির নামে বহু শিল্পকর্তা হাজার হাজার কোটি টাকা নানা ঘুরপথে বিদেশে পাচার করছে, আবার সেটাও ঘুরপথে এদেশে এনে খাটিয়ে লাভ করে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে দেশের উন্নয়ন, যা নিয়ে এত ঢাক-ঢোল পেটানো চলছে। এর পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য নিয়োজিত জাতীয় কমিশনের রিপোর্ট মেলালে আমাদের সমাজের বৈষম্যের চিত্রটা নগ্নভাবে ধরা পড়ে। ঐ কমিশনের রিপোর্ট দেখিয়েছে, ১১০ কোটির দেশে প্রায় ৮৪ কোটি মানুষ প্রতিদিন ২০ টাকা বা তার চেয়ে কম খরচ করতে পারে। প্রায় একই তথ্য পাওয়া যায় সাকসেনা ও তেণ্ডুলকর রিপোর্টেও। এর পরেও যখন স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দেশের শাসক ও বিরোধী নেতা-মন্ত্রীরা ভারতীয় গণতন্ত্রের অপার মহিমা নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন, তখন তাকে ঠগবাজি ছাড়া আর কী বলা যায়?

স্বাধীনতার পর থেকে এভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিনা বাধায় বাইরে পাচার হওয়ার ঘটনায় এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, শুধু শাসক রাজনীতিকরা নয়, ভারতের গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই আজ চরম দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে। উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থনীতি হচ্ছে সমাজব্যবস্থার বুনিয়াদ। সেই বুনিয়াদই যখন দুর্নীতিগ্রস্ত, তখন তার 'সুপারস্ট্রাকচার' বা উপরিকাঠামো হিসাবে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলিও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। পতাকার রঙ যাই হোক না কেন, সমস্ত ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলই যে আজ দুর্নীতিগ্রস্ত, তার মূল কারণ এখানেই। তা হচ্ছে, এই সমস্ত রাজনৈতিক দলই পুঁজিবাদের সেবাদাস। ফলে, দুর্নীতি তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকবেই। আপাদমস্তক দুর্নীতির ব্যাপ্তি আর একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করেছে। তা হল, ভয়াবহ দুর্নীতির ঘটনাতেও জনমন আগের মতো বিচলিত হচ্ছে না। অনেকটাই যেন দুর্নীতি গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনাও পুঁজিবাদী রাজনীতিকদের বেপরোয়া দুর্নীতি চালাতে সাহায্য করছে। সরকারও দু-চারটে গরম বুলি আউড়ে দায় সেরে দুর্নীতিবাজদের আড়াল করছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই ধরা পড়ে, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা পাচার ও তা নিয়ে দুর্নীতি কিন্তু আঘাত করছে জনসাধারণকেই। যে পুঁজির দেশের মধ্যেই বিনিয়োজিত হয়ে শিল্প কল-কারখানা বা অন্যান্য ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটানোর কথা, তা আজ শিল্প কল-কারখানা-কৃষিক্ষেত্র ছেড়ে কালোবাজারি ও ফাটকাবাজি করে অতি মুনাফার জন্য ছুটছে অন্যত্র। ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইটা শুধু নৈতিকতার প্রশ্ন নয়, এর সাথে জনসাধারণের বস্তুগত চাহিদার প্রশ্নও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমরা মার্কসবাদীরা যখন বলি, ভারতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া জনজীবনের কোনও মূল সমস্যারই যে সমাধান হতে পারে না, আমাদের সেই বক্তব্যের সত্যতা নিহিত রয়েছে এখানেই। এ কারণেই এই পুঁজিবাদী সমাজে দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতির সন্ধান একমাত্র যথার্থ বিপ্লবী রাজনীতির মধ্যেই পাওয়া যাবে। কারণ, সে রাজনীতির মূল স্বার্থই হচ্ছে, শোষণ-জুলুমকারী দুর্নীতিমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। একের পর এক কেলেঙ্কারি উদঘাটিত হওয়ার মতো ঘৃণ্য পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এ সত্যটা আজ জনগণকে বুঝতে হবে।

৬ ডিসেম্বর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করুন

প্রথম পাতার পর

আশা করেছিলেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের মামলার রায়ে তাঁরা ন্যায্য বিচার পাবেন। কিন্তু যেভাবে অযোধ্যা হাইকোর্টের রায়ে ইতিহাস, আইন, সাক্ষ্যপ্রমাণ সবকিছু অস্বীকার করে শুধুমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে রামজন্মভূমির দাবিদারদের বক্তব্যতেই সায় দেওয়া হল, তা ন্যায়বিচারের বুর্জোয়া আইনশাস্ত্রসম্মত ধারণারও পরিপন্থী। প্রকাশ্য দিবালোকে যারা উন্মত্ত তাণ্ডবে বাবরি মসজিদকে ধ্বংস করল তাদের শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, অযোধ্যা হাইকোর্টের রায়, আফগানিস্তানের তালিবানী কাণ্ডের সাথে তুলনীয় হিন্দুত্ববাদীদের তাণ্ডবকেই কার্যত ন্যায়সম্মত ও আইনসিদ্ধ করে দিল। 'শান্তিরক্ষা'র নামে এই চূড়ান্ত অন্যায় ও সাম্প্রদায়িক বিচারকে মেনে নিলে সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

সরকার, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার এই নগ্ন প্রকাশ স্বভাবতই সংখ্যালঘু জনমনে গভীর আঘাত দিয়েছে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক চিন্তাসম্পন্ন মানুষকে উদ্বিগ্ন করেছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি আহ্বান জানিয়েছে ৬ ডিসেম্বর সারা দেশে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করার। এই আহ্বানে সাড়া দিতে আমরা জনগণের প্রতি আবেদন জানাই।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in